"Animals have these advantages over man: they never hear the clock strike, they die without any idea of death, they have no theologians to instruct them, their last moments are not disturbed by unwelcome and unpleasant ceremonies, their funerals cost them nothing, and no one starts lawsuits over their wills." - Voltaire

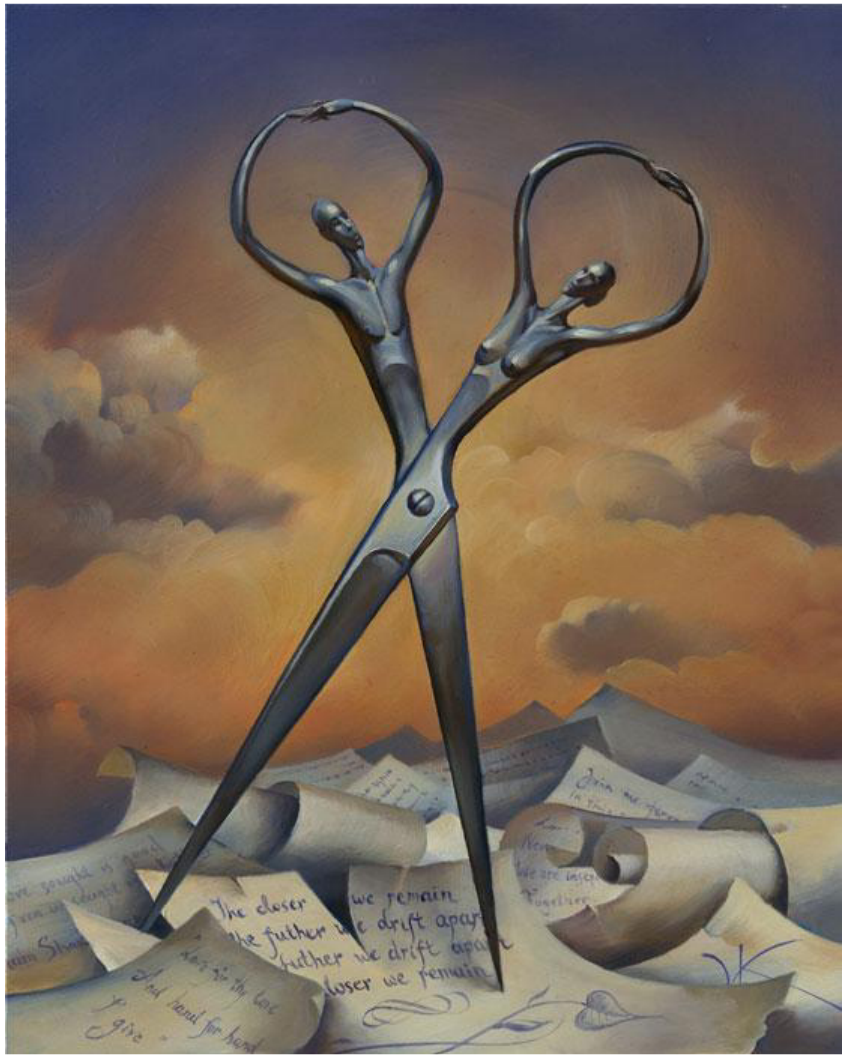

চিঠির চিলেকোঠায়

রমিত দে

চিঠির ইতিহাসে এক একটা সময় আসে যখন চিঠি তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলে আর হয়ে পড়ে আমাদেরই ছায়ামুকুর; জীবনবৃত্তান্তের সমীকরণ হয়ত সেখানে টানা যায়না তবে এমনই সব চূর্ণ চূর্ণ স্মৃতিলেখার কিছু ক্ল্যাসিক স্টাডি কখনও সখনও হয়ে ওঠে সৃজনের মহাভাষ্য। পায়ে পায়ে প্রস্তুত করে পথ, প্রস্তুত করে অতিমুগ্ধ কোনো কোনো আত্মজীবনী। দীর্ঘ একটা সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে তোমার দিকে তাকায়, যেন তার খেয়াল হল তুমিও তাকিয়ে আছ ও বাড়ির সবটা দেখবে বলে, আঁধার আড়াল চিনবে বলে। সরল হাওয়ায় উড়ে উড়ে অতীতের নীল অক্ষর উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে নিজেরই অন্ধকারে কিংবা চিরন্তন এক আলোকরেখা ধরে ধরে। চিত্রার্পিত সে সব জগত। তার সাথে অনেক গল্প। আর গল্পের খাঁজে খাঁজে লুকোনো সব সুগন্ধি পাতার নির্যাস। গন্ধের থেকে কেই বা আর বেশি কথা বলে ! অতীত থেকে আবহমানে ফিরে ফিরে এসে সেসব সুদীর্ঘ কথপোকথন কখনও হয়ে ওঠে ভালোবাসার অধরা অপেক্ষা তো কখনও বা একা একা অক্ষরশরীরে রঙীন সুতো খোঁজে ‘প্লেতোনিক প্রণয়’। চিঠি হয়ে ওঠে চিন্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী। যা রইল আর যা রইল না তারই ফাঁকে ফাঁকে কত যে নতুন দেশ কত যে নির্বিকার থাকা ! কান পেতে থাকলেই শোনা যাবে চিরন্তন সেসব অভিমান, অলক্ষ্য অমল আনন্দ। বুদবুদের মত অতীতের থেকে যারা ভেসে আসে নান্দনিক সব রূপকথা নিয়ে। সে সব বৃষ্টির ঘর সে সব অনন্ত বর্ণমণ্ডল, ফেলে আসা মানুষের মনোভূমিতে নিঃশব্দে প্রবেশ করে আর নির্মিত হয় চিরায়মান জীবন উৎসব, নির্মিত হয় স্থির আর স্থবিরের বাইরের জায়মান অনিমন্ত্রিত এক যত্নসহকার সঞ্চয়। ঝর্ণাকলম থেকে বেরিয়ে আসা সাদা আর কালোর কাটাকুটিতে কেবল এক সঞ্চয়, যে সঞ্চয় প্রতিনিয়ত জোগান দেয় বেঁচে থাকার রসদ, বাঁচিয়ে রাখার বিস্ময়। এ যেন যাপনের মাঝেই এক অন্য যাপন, শব্দের মধ্যেই কুড়িয়ে পাওয়া শব্দ, জল থেকে ফিরে আসা জলেরই অনুরণন যেন। একটা থাকা। একটা বৃহত্তর থাকা। জাঁ অস্টিন লিখেছিলেন - যে মানুষটা দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারে সে মানুষটা সারাজীবনে সামান্যতম অসুখ লিখতে পারেনা ; হ্যাঁ চিঠির মধ্যে দিয়েই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় বহুযুগের সেসব নিরাময় যার কোনো প্রশ্ন নেই প্রতিশ্রুতি নেই অথচ প্রতিনিয়ত সতেজ কাঁচা ও কচি হওয়ার প্রত্যয় আছে ; অক্ষরের আদলে চূর্ণ বিচূর্ণ পথই সেখানে হয়ে আছে শাশ্বত পর্যটনের প্রেরণা।

যেমন ধর ১৭১৩ সালে উনিশ বছরের কোনো সদ্য যুবকের তার সতেরো বছরের প্রেয়সীকে লেখা চিঠিটি টোকা মারল আমাদের গল্পে,

আমরা কি দরজা খুলে দেব না ? দুলিয়ে দেব না তিনশো বছরের উপচানো ইতিহাস ? আর যদি সে চরিত্ররা হয় ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে ভলতেরের মত কোনো যুগপুরুষ আর তাঁর শৈশবের প্রেমিকা অলিম্পি ডুনোভার ! ক্ষীনতোয়া চিঠির মাঝে খানাতল্লাশি তো হবেই। খোঁজ পড়বে সপ্রাণ যুবকের লায়েক হয়ে ওঠা কাহিনীকল্পের। ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলো ঘুরে বেড়ানো মনোযন্ত্রগুলো, চেনা আর অচেনার মাঝের সেই নিরুচ্চার আবহমানগুলোই তো হয়ে উঠবে আমাদের নির্মাণের সমগ্রতা। ভলতেরের জীবনটা সবসময়ই বেপোরোয়া আর সংস্কারের অর্গল ভাঙা। বিচ্ছিন্নতাই সেখানে প্রতি মুহুর্তে বিশেষ হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম প্রেমেও তার অন্যথা হয়নি। বিত্তবান ঘরের সুন্দরী অলিম্পাস কে ভালোবেসে গেলেন জেলে, কারন প্রেমিকার মা আবার নাকি ফরাসী রাজদূতের কাছের মানুষ আর যথারীতি ভলতের সামন্ত সমাজের চোখের বিষ। তো, জেল থেকে বসেই প্রেমিকাকে লিখে ফেললেন তার মনের কথা, পাঁজর রেগে উঠছে অথচ পাণ্ডুলিপি প্রাণের ধ্বনি, ঠান্ডা ভেজা কৈশোরের রোমাঞ্চ। মোহতরু হয়ে সে চিঠি আমাদের নিয়ে চলে দূর থেকে কাছে। কি লিখল ভলতের ! -

“...এখানে আমি বন্দী হয়ে আছি। ওরা হয়ত আমায় প্রাণে মেরেও ফেলবে কিন্তু ভালোবাসা ! যে ভালোবাসা তোমার জন্য রাখা আছে সযত্নে, তাকে ছুঁতেও পারবে না। আমার আদরের অলিম্পি আজ রাতেই আমি তোমায় দেখতে পাব অবশ্যই যদি এদের পাহারা গলে পালাতে পারি,পালাবই !

আর হ্যাঁ ভগবানের দিব্যি, ওরকম বিষাদগ্রস্ত চিঠি আমাকে লিখো না। তুমি বাঁচবে, বাঁচতে তোমাকে হবেই একটা সুন্দর সাদা সমাজের জন্য আর সর্তকও থাকতে হবে। বিশেষ করে তোমার মায়ের থেকে, উনিই এ মূহুর্তে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু। আর কি বলতে পারি ? সবার থেকে সজাগ থাকো, বিশ্বাস কোরোনা কাউকে আর তৈরী হয়ে থেকো। চাঁদ উঠতে না উঠতেই ছদ্মবেশে পালাবো, যেকোনো একটা গাড়ী বা ঘোড়ায় চেপে আজই আমরা পালাবো ধূলোর মত সবটুকু ছায়াকে উড়িয়ে। তারপর সোজা সেভেনিনজেন। জীবন থাকবে, থাকবে জরুরি কাগজ আর কালি, আমরা আমাদের চিঠি ছেড়ে যাব চলমান জীবনের ভেতরে।

যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাকো, নিজেকে আরও একবার নিজের কাছেই নিশ্চিত করে নাও। আর মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে রাখো। তোমার মা যেন কিছু মাত্র টের না পায়। সাথে নিজের ছবি নিও আর সবসময় বিশ্বাস রেখ পৃথিবীর চরমতম অত্যাচারও তোমার কাছে পৌঁছতে আমাকে বাধা দিতে পারবে না। না, কোনোকিছুই না, কোনোকিছুরই ক্ষমতা নেই তোমার থেকে আমাকে আলাদা করার। আমাদের ভালোবাসা বিশ্বাসের ওপর অঙ্গীকারের ওপর দাঁড়িয়ে আর যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণই তা আমাদের সাথে থাকবে।

এখনকার মত বিদায়, তোমার জন্য করতে পারিনা এমন কোন কাজ এই পৃথিবীতে নেই। বরং তার থেকেও অনেক বেশী পাওয়ার উপযুক্ত তুমি। বিদায়, সোনা- - .....তোমার আঁরুয়ে...”

ইতিহাস বলছে কথা রাখতে পেরেছিলেন ভলতের। জেল থেকে পালিয়েওছিলেন প্রেমিকার কাছে। প্রতিবার ‘বিদায়’ শব্দটিকে মূল চিঠিতে ‘Adieu’ দিয়ে যে উচ্চারণ করেছেন ভলতের তার ভাবানুষঙ্গ বোধহয় বাংলা ‘বিদায়’ শব্দে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব না কারন Adieu সুরের মাঝে যেমন লুকিয়ে আছে একজন যুবক যুবতীর বেদনাবিদ্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আক্ষেপ, তেমনি সাথে সাথে এক ছন্দময় মিলনের আকুতিও। কিন্তু চিঠির ইতিহাসে ভলতেরকে এখানেই থামিয়ে দিলে চলবে না। প্রতিষ্ঠানের কাছে দাঁড়িয়ে বারবার তার মেজাজটা যেমন অপ্রতিষ্ঠানের, রাজশক্তির বিরাট দম্ভের কাছে তিনি যেমন বারবার হয়ে উঠেছেন মুক্তির প্রকৃত পরিব্রাজক, ঠিক তেমনি ভালোবাসাও ভলতেরকে চিরনতুন জানা না জানার কক্ষকোণ থেকে লক্ষ্য করেছে বার বার। আর তাঁর সার্বিক চিঠিগুলিই হয়ে উঠেছে চুরাশি বছরের এক মানুষের হৃদিমালঞ্চের সেইসব তোলপাড় ধ্বনিতরঙ্গে প্রবেশের সূত্র …

চিঠি থেকেই উঠে এসেছে নিজের ভাগ্নী মাদাম দনির প্রতি ভলতেরের আশ্চর্য প্রেমকাহিনী। ইংরেজী, লাতিন, স্প্যানিশ আর ফরাসী ভাষায় লেখা ১৪৮ খানা অপ্রকাশিত চিঠি কালের কবর খুঁড়ে আমাদের সামনে তুলে আনে ছোটোবেলায় মা হারানো ভাগ্নী দনির প্রতি ভলতেরের স্নেহ থেকে শুরু করে এক অদম্য প্রেমযাপন। কেউ হয়ত বলবেন বিকৃতকাম, কেউ হয়ত গবেষণা করবেন প্রেম নয়, মাদাম দনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ভলতেরকে এবং তার স্বপক্ষে যুক্তিও দেখাবেন, কেউ কেউ হয়ত গল্পে আরও ফুঁ দেবেন কিন্তু সেসব আমাদের বিষয় নয়, কেবল এক গোছা চিঠি কীভাবে নজরবন্দি করে রাখতে পারে দুটো মানুষের পারস্পরিক আশ্রয়, দুটো মানুষের গোপন গৃহজীবনকে তাই আমাদের আবিষ্কার তাই আমাদের জীবনের অন্তর্মূল পরিক্রমা। সিরে নামের ছোট্ট নির্জন গ্রাম থেকে এবং পরবর্তীকালে ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখা ভলতেরের চিঠিই একজন মামা এবং তার ভাগ্নীর গোপন মীড়ের নিমগ্নতম সাক্ষী হয়ে থাকে। ১৭৪৪ এ স্বামী নিকোলাস চার্লস দনির মৃত্যুর পর থেকেই মাদাম দনির প্রতি ভলতেরের নিভৃত আকর্ষণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং শেষ জীবনে জেনেভা আর ল্যসেনের মাঝামাঝি ‘Chateau de Prangins’ এ কেনা বাড়িতে মৃত্যুর দিন অবধি রয়ে যান দনি ও ভলতের্। মৃত্যুর আগেই ভলতের তার সম্পত্তির উত্তারাধিকারও করে গেছিলেন ভাগ্নী মাদাম দনিকে। শুধু এটুকুই না, চিঠির মাধ্যমেই শোনা যায় একটি সম্পর্কের মাঝের গূঢ় আত্মীয়তার শব্দ, যেন আকুল সুতো বেয়ে উঠে আসা যাপনের বিস্তীর্ণ তাঁত বোনা. . .

স্বামীর মৃত্যুর পর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভাগ্নীর উদ্দেশ্যে ১৮ ই এপ্রিল ১৭৪৪ এ সিরে থেকেই ভলতের লেখেন-

“আদরের দনি, তোমায় লিখতে লিখতে চোখের জলে ভিজে যাচ্ছে চিঠির পাতা। যদি আমার অসুস্থ শরীর সায় দিত যদি আমি এই মূহুর্তেই তোমার পাশে থেকে কাঁদতে পারতাম তাহলেও কিছুটা হালকা হওয়া যেত। এই দুঃসংবাদ যখন পাচ্ছি তখন ভিনসেন্ট (দনির ভাই) আর marquis Du Chatelet আমার সাথেই রয়েছে। তোমার কাছে গিয়ে এই মূহুর্তে সমবেদনা জানানো যেত কিন্তু তা হত খুব ক্ষণস্থায়ী

কিছু সান্ত্বনা দেওয়া এতবড় দুঃখের কাছে খুবই সামান্য। প্রিয় দনি, এই সেই মূহুর্ত যখন মানুষকে নিজের সবটুকু শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে হয়, সবটুকু সাহস জড়ো করতে হয়, যদিও এ মুহুর্তে এসবই কথার কথা। কতটুকু দুঃখ প্রকাশ এ মুহুর্তে যথেষ্ট আমি জানি না। তোমাকে নিয়ে কতটুকু চিন্তা করলে শান্তি পাব আমি জানি না। তোমার শরীর নিয়ে কতটুকু দুঃশ্চিন্তা করলে ঠিক হবে- আমি নিজেও জানিনা। অন্ততপক্ষে এই জিনিসটার খেয়াল রেখ। আমার কথা ভেবে অন্তত।

তোমার নিজের কথা একটু ভাব। ভবিষ্যতের কথা। এটা আমার অনুরোধ, যে কি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ বা কি কি করবে বলে ঠিক করেছ আমাকে তা বিস্তারিত জানিও। নিকোলাসের ভাই কি তোমার সাথেই আছে ? ওখানে থেকে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিই বা করবে বরং প্যারিসে চলে এস, হয়ত অক্টোবর নাগাদ আমিও ওখানে চলে আসব। এটা আমার দুর্ভাগ্য যে আমার জীবনের বাকি দিনগুলোর প্রতিটা মুহুর্ত আমি তোমার সাথে কাটাতে পারছিনা কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে চাই সামনে থেকে যতটা সম্ভব। বুঝতে চাই।.....বিদায়। সাহসে থেকো । অন্ধকার পথটার ভেতর ফেরা যায়, দাঁড়িয়ে থাকা যায় কেবলমাত্র আলোর দর্শন ধরে, আর ওই আলোর দর্শনে থাকাকেই জীবনের উপজীব্য করে তোলো। জীবন অনেকটা স্বপ্নের মত, একটা দুঃখের - যন্ত্রণার স্বপ্নের মত, কিন্তু তবু বেঁচে থাক সুস্থ থাক আমার জন্য, তোমার বন্ধুদের জন্য যারা তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে...।। ”

প্রথম থেকেই বড় ভাগ্নী দনির প্রতি ভলতেরের ভালবাসা চোখে পড়ার মত, বারংবার তাঁর কথায় তাঁর ভাষায় ফুটে উঠেছে এক অনতিক্রম স্নেহ থেকে আনন্দ ও তৃপ্তি ; মা বাবা মারা যাওয়ার পর একদিকে ভলতের যেমন মামা হিসেবে এলিজাবেথ ও দনি - দুই বোনের অভিভাবক হয়ে ওঠেন তেমনি দনির নাটক ও ফরাসী সাহিত্য- শিল্পের প্রতি ভালোবাসা ভলতেরকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত দনির যুক্তিনির্দেশিত সাংস্কৃতিক পৃথিবীতে। তাঁর শুভকামনাগুলিও যেন ছিল বেশিরভাগই দনির পক্ষে। কিন্তু মানুষের মন, সে বরাবরের মতই বেষ্টনিতে দাঁড়িয়ে বেড়া ভাঙার ব্যকরণ খুঁজে চলেছে, তাঁর মূল চিত্রটি কোথাও মিথের দ্বারা আবৃত ; ভলতেরের সাথে দনির সম্পর্কেও এক আশ্চর্য আশ্রয়ের প্রশ্ন বার বার উঠে আসে, যেখান থেকে ভালোবাসার সপ্রাণ ও সাংকেতিক প্রশ্ন ওঠে, প্রশ্ন ওঠে জৈবিক সম্পর্কেরও। ১৪ ই মে ১৭৪৪ এর চিঠিতে ভলতের যখন বলেন - *“I am talking about spending a month with you my dear niece. But I wish it were my whole life. It seems to me ridiculous to content myself with wishing it. I imagine that we would live together pleasantly, and that we would help each other to bear the bitterness of this life.”* - তখন ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাটিই যেন বেজে ওঠে ধূ ধূ নীরবতাকে কেন্দ্র করে। গাঢ় ঘুমের রক্তে ভেসে ওঠে দুটি মানুষের ভেতরের ‘আমি’ র এক দুর্বোধ্য প্রীতিকাহিনি। মাঝখানে অন্ধকার বর্তুলের মত পড়ে থাকে সমাজ রীতি নীতি সংস্কারের মত কিছু আবহমান বনবাস। অথচ অস্তিত্ব সে তো জীবনের নিবিড়তম আনন্দের জন্য সমাজের তুচ্ছতাকেও মেনে নিতে পারে, মেনে নেয়। সমাজ সংস্কার বিধি নিষেধের বাইরে ভাবার সাহস দেখায় আর ভলতেরের চিঠি ধরে ধরে আমরাও পৌঁছে যাই সম্পর্কের এমনই সব সহবাস শীৎকারের

কাছাকাছি। ভলতেরের শেষের দিকের উপন্যাস 'আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি'তেও (Les Lettres D'amabed, Etc, Traduites Par L'Abbe Tamponet) নায়ক নায়িকার চরিত্রে যে সুন্দরী 'আদাতে' আর যুবক 'আমাবেদের' উপস্থাপনা হয়েছে তাও বিশ্লেষকরা মনে করেন উপন্যাসের চরিত্রে ভলতের আসলে তাঁর আর মাদাম দনির পারস্পরিক প্রতিচ্ছবিই খুঁজেছিলেন। ''আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি''তে ভলতেরের ব্যক্তিগত জীবনের ভ্রমণকাহিনীর কিছু অংশ উঠে এসেছে, প্রুসিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বার্লিনের রাজসভা ত্যাগ করে স্ট্রাসবুর্গ থেকে ভাগ্নী মাদাম দনির সাথে তার ফিরে আসার বর্ণময় অভিজ্ঞতার কিছু ছায়াপাত ঘটেছে। উপন্যাসে গোয়ায় আমাবেদ ও আদাতের গ্রেপ্তার এবং বন্দী হওয়ার ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভলতের প্রুসিয়া থেকে ফেরার পথে সম্রাটের প্রতিনিধি দ্বারা তার এবং মাদাম দনির গ্রেপ্তারের ঘটনারই শৈল্পিক উচ্চারণ করেন;

যাই হোক, দেখা যাক ১৩ ই আগস্ট, ১৭৪৬ এর চিঠিতে ভলতের কি লিখলেন -

''প্রিয় দনি, কিছু দিনের মধ্যেই তোমাকে জড়িয়ে ধরার আশ্বাস পেতে চলেছি। সিরের শান্তি ছেড়ে ফিরছি প্যারিসের কোলাহলে। তোমার কাছে। এটা আমার কাছে খুবই জরুরি।...আমাকে যেতেই হবে কারণ এই একটাই উপায় তোমাকে দেখতে পাওয়ার, একে অপরকে সান্ত্বনা দেওয়ার, যা তুমি হারিয়েছ তার জন্য সান্ত্বনা আর যা আমি মনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে করে চলেছি তার সান্ত্বনা, ...অনেক অনেক ভালোবাসা। অপেক্ষা কোরো একরাশ আলিঙ্গনের''...

চিঠির ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব নিয়মের বাইরে টুকরো টুকরো অর্ঘ্যে ভরা আনন্দের অরুণা। অদ্ভুতভাবে মাদাম দনির চিঠিগুলিতে এই উষ্ণতা না পাওয়া গেলেও ভলতের যে দনিকে বিশেষ চোখে দেখতেন তার প্রমাণ তার দিব্য আনন্দ খুব ছোটো ছোটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে সমীকৃত হয়ে ওঠে। কখনও 'Rameau Ballet' দেখাবার জন্য সাত হাজার পাঁচশ টিকিটের দাবী থাকলেও ভলতের তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ খাটিয়ে বন্দোবস্ত করে দেন ব্যালে দেখবার অনুমতি আর চিঠিতে লেখেন - *"My beloved, I will do everything in my power for you"* আবার কখনও 'ফ্রগ ব্যালে'র আশানুরূপ সম্পাদনা না হওয়ার প্রেক্ষিতে দনিকে লেখা চিঠিতে ব্যালের বিস্তারিত সমালোচনার শেষে উল্লেখ করেন - *"I say this only to you. I am in the habit of saying things to you that I do not say to others"* । মনের সবকটা দরজাই এভাবে দনির কাছে খুলে রেখেছিলেন ভলতের আর সম্পর্কের অলীক চাবিটাটাও। হ্যাঁ, এক মনোরমা বিশ্বাসের থেকেই দনির প্রতি ভালোবাসা পেয়ে বসেছিল ভলতেরকে। ছোটোবেলায় মা হারানো ভাগ্নীর কাছে তিনি যেমন হয়ে উঠেছিলেন আশ্রয়দাতা বাবার ভূমিকায় ঠিক তেমনি পরিণত দনির মাঝেই তিনি খুঁজে ফিরেছেন তাঁর শেষ চল্লিশ বছরের প্রেম। প্রেম ! এমন অসুস্থ প্রেমের কথা হয়ত মানানসই হবে না পার্থিব গোলার্ধে, তদন্ত হবে অনুসন্ধান হবে সমাজের পবিত্র 'ইনকুইজিশনে', কিন্তু তাতে কি ! ভলতের তো তা ভাবেননি, তাঁর কাছে পারস্পরিক বিচ্ছেদ ছিল সোনালী সুতোয় বাঁধা কোনো এক অপার্থিব মিলনেরই অপেক্ষা। বারবার

উল্লেখ করেছেন - **“আমরা দুজনেই কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছি, আর সেই কষ্ট একে অপরের থেকে দূরে থাকার। আমার সুখ আর অসুখ সবেতেই আমি তোমায় ভালোবাসব, তা ছাড়া উপায় নেই”**।

১৭৪০ থেকে ১৭৫৩ প্রুসিয়ার সম্রাট ফেড্রেরিকের রাজসভায় ভলতেরের জীবনের এক উজ্জলতম ও বর্ণময় অধ্যায়। আর এই সময়েই বিশ্লেষকদের মধ্যে হাজার একটা প্রশ্ন জেগেছে মাদাম দনির ভালোবাসার ঘনত্ব নিয়ে। প্রুশিয়ায় ভলতেরে সাথে যেতে চাননি দনি, আবার পাশাপাশি ‘bacular d’Arnaud, ‘Marmontel’, বা ‘Ximenes’ এর ন্যায় তার একাধিক প্রেমিকেরও খোঁজ মিলেছে। কিন্তু ভাগ্নীর প্রতি ভলতেরের ভালোবাসা সমস্ত সন্দেহের অতীত এবং কোথাও কোথাও সে আবেগে অন্ধও। কেবল মানসিক আশ্রয়ই নয়, দৈহিক সংরাগের অমীমাংসিত আক্ষেপও তাপতরঙ্গ হয়ে প্রতিফলিত হয়েছে চিঠিতে। ১৭৪৫- ৪৬ এর মাঝামাঝি কোনো সময় লেখা চিঠি থেকে আমরা পাচ্ছি - *“My dear, One would think that I dare not show myself to your beautiful *** since I contaminated your house. I am unworthy of you, my dear one, but I am none the less afire to see you again”* । (***) চিহ্নিত জায়গাগুলি ভলতের ফাঁকা রেখেছেন তার চিঠিতে এবং তার আগের শব্দের ফেমিনাইন প্লুরাল থেকে এটা বোঝা অসম্ভব না সেখানে দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনাই ছিল। ভলতের এবং দনির সম্পর্কে স্বাভাবিক দাম্পত্যের আঁচ যে ছিল তা আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যখন একই চিঠিতে ভলতের লেখেন-

“আমি তোমার সাথে কেবল একটা সকাল নয়, একটা দুপুর আর আস্ত একটা সন্ধ্যেও কাটাতে চাই দনি। কিন্তু সমাজের হাওয়ামোরগ বারবার আমাকে সরিয়ে দেয় তোমার কাছ থেকে। সে যে কি কষ্ট ! কি যন্ত্রণার ! কখন তোমার প্রেমিক কেবল তোমার সাথেই মিলিত হতে পারবে দনি ? ”-

কোনো এক শনিবারে লেখা এই চিঠি আমাদের অতিশূন্য প্রেম থেকে আরও একটু গভীরে নিয়ে চলে, নিয়ে চলে প্লেতোনিক থেকে ফিজিক্যাল প্রণয়ের হাওয়াগুনে। সাথে সাথে পরবর্তীকালের চিঠিগুলোতে বারংবার “তোমাকে চুম্বন করি”, “তোমাকে ভালোবাসি”, “সহস্র চুম্বন তোমার জন্য” বা “জীবনের শেষ দিন অবধি তোমায় ভালোবেসে যাব” জাতীয় অব্যয়গুলিও প্রগাঢ় ভালোবাসার ভেতর শরীরপ্রবেশকেই কোথাও সহজ করে দেয়।

হাজার কাজের মধ্যেও, অসুখের মধ্যেও ক্ষতস্থান লুকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভলতেরকে বাড়ি ফিরিয়েছে দনির প্রতি ভালোবাসা ; আর এসবই আজ আমরা তিনশো বছর আগের চিঠির অ্যালবাম খুললেই দেখছি ছবির ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে কি অসাধারণ সব প্রতিধ্বনি, বিস্মৃত নিঝুম অথচ অপরিহার্য। দনিকে লেখা চিঠিতে ভলতের লিখেছেন প্যারিসে এসেই তাঁর প্রথম কাজ এক ছুট্টে দনির কাছে চলে আসা, এসেই

তাকে খুঁজে বের করা আর প্যারিসে থাকাকালীন তাঁর শেষ কাজটাই হল দনির দুটি পা জড়িয়ে চুপটি করে বসে থাকা। না কোনো কথা নয়, খাওয়াদাওয়া নয়, কেবল দু চোখ মেলে তাকে দেখা আর দেখা আর হাজার হাজার চুম্বনে ভরিয়ে দেওয়া প্রণয়ীর অতীন্দ্রীয় ওষ্ঠ। চিঠিগুলো কোথাও যেন হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করে আনে এক অতিসাধারণ ভলতেরকে, যিনি দার্শনিক নন যুক্তিবাদী নন মহৎ কোনো অমর ব্যক্তি নন কেবল প্রণয়ে একাকার আপাদমস্তক এক প্রেমিক। প্রায় তিনশো বছর আগের এক দিগদর্শী দার্শনিকের ভেতর লুকিয়ে থাকা একজন বিতর্কিত প্রেমিককে আমরা খুঁজে পাই ভলতেরের চিঠি থেকে। খুঁজে পাই অনিকেত স্রোতে হারিয়ে যাওয়া বালি লেগে থাকা কিছু অচেনা দীর্ঘশ্বাসকে। ভলতেরের মৃত্যুর সাথে সাথেই দনি বেচে দেন তাকে দেওয়া ভলতেরের স্থাবর বাড়িঘর, হয়ত প্রণয় কেবল সুবিধার প্রতীক ছাড়া দনির কাছে আর কিছু ছিলনা, হয়ত একাই ছকের বাইরে ভাবার সাহস দেখিয়ে গেছেন ভলতের, বিশ্লেষকরা গবেষকরা খুঁজে যাবেন কী ছিল সেসব আসল নকল, আদি সূত্র, কিন্তু আমরা কিছু চিঠির আস্বাদেই কালগর্ভের ভেতর ঝাঁপ দিতে পারি, খুঁজে পেতে পারি জীবনেরই কিছু প্রসারিত দর্শন, খুঁজে পেতে পারি অলীক ঘাইয়ের সন্ধান।

দনির প্রতি ভলতেরের ভালোবাসাকে কেবল প্রীতি বা সখ্যতা বলা যাবে না, বলা যাবে না দেহাতীত প্রেম, বরং মুহুর্মুহুঃ পত্রবিনিময়ে যা ঘটে তা বিধিনিষেধ মানেনা সমাজের, প্রেমের নৌকোয় না ভেসে ডুবে যেতে চায় মহাকাব্যপ্রতিম এক মানুষের ভেতরে ঘুমহীন জেগে থাকা নিভৃত নড়বার শব্দগুলো। দনির অসাক্ষাতে রোগগ্রস্থ অবসাদগ্রস্থ ভলতেরকে আমরা লিখতে দেখি-
“I am not well, but I will see you. I should like to live at your feet and die in your arms”- এরকম আর্তির সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি মনে পড়ে যাচ্ছে আয়ুবের ‘‘এ দুর্লভ প্রেম’’এর অংশটি - ‘‘উত্তীয় যখন শ্যামাকে বলে - ‘‘ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, শুধু তোমারে জানি’’, সে কোনো গভীর জ্ঞানের কথা বলতে চায়নি, বলতে পারার মতো বয়স তার হয়নি ; শ্যামার জন্য সব- কিছু করতে বলতে পারার মতো বয়স তার হয়নি ; শ্যামার জন্য সব- কিছু করতে, সব- কিছু হারাতে সে প্রস্তুত- এটুকুই জানাতে চেয়েছিলো তার তরুণ কিন্তু পূর্ণবিকশিত প্রেম’’ - হয়ত বয়সের ফারাক তবু দনিকে লেখা ভলতেরের চিঠির যে সংকেতময় নির্মল আর্তি সে কি উত্তীয়ের ভালোবাসার চেয়ে কোনো অংশে কম !

ছোটো থেকেই মাদাম দনি ছিলেন ভলতেরের পছন্দের ভাগ্নী, শিক্ষা- দীক্ষা থেকে শুরু করে দর্শন, সবেতেই দনির মাঝেই তিনি খুঁজে পেতেন তার উত্তরসূরীর অঙ্গীকার। সিরে বা প্রুসিয়ায় বসে দনির চিঠি পড়তে পড়তে বিভোর হয়ে যেতেন ভলতের। শিল্প সম্পর্কে তার মতামতে আকৃষ্ট হয়ে বিশাল এক নিস্পত্র গাছের মত কোথাও কচি সবুজ নতুনকে ছায়া দিয়ে বারবার নিজের সর্বত্র্য নিয়ে ঝুঁকে পড়তেন আঁরুয়া। শরীরও ভেঙে পড়ছিল তাঁর। ১৭৪৫ বা ১৭৪৬ এর চিঠিগুলো থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় আজীবন একজন সংস্কার ভাঙা মানুষ, আশ্রয় দেওয়া মানুষ ক্রমশ শারীরিক ভাবে ভেঙে পড়ছেন, মাদাম দনিকে লেখা চিঠিতে বারবার উঠে এসেছে পাকস্থলীর অসুখের প্রসঙ্গ অথচ বারবার তিনি বোঝাতে চেয়েছেন দনি সুস্থ থাকলেই তিনি সুস্থ, দনির প্রতি কখনও কখনও এমনই চৈতন্যহীন ভালোবাসা দেখতে

পাওয়া যায় ভলতেরের চিঠিতে। একে হয়ত কেউ কেউ পাগলামি বলবে, কিন্তু ভালোবাসার কাছে থাকা মানেই তো পাখির কাছে থাকা পাগলামির কাছে থাকা হালকা হয়ে থাকা আর ভলতেরও তাঁর অজস্র পুস্তিকার মাঝে অজস্র পরিকল্পনার মাঝে কোথাও যেন এই একটা জায়গাতে এসেই হেরে যেতেন, পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে যে গভীর অন্তরঙ্গতা সেখানে শুধু প্রেম নয়, দনির প্রতি সদাসতর্কতা এবং যত্নও পাঠকের মনোযোগ দাবী করে। নিজের অসুস্থতা স্বত্ত্বেও তাঁর চিঠিতে উঠে আসে দনির শারীরিক অবস্থার নিয়মিত খোঁজ নেওয়ার মত বিষয়গুলিও। ১৭৪৬ এ প্রুসিয়া থেকে তিনি লেখেন-

"How is my dear one ? How is the headache from which she was suffering ? What has she been doing ? What is she doing, what is she going to do ? …I kiss you tenderly. I love you with all my heart" ।

ভলতেরের প্রেরিত বেশীরভাগ চিঠিতেই মাদাম দনি প্রাপ্তির তারিখ লিখে রাখতেন, যদিও সেসব তারিখ নিয়ে পরবর্তীকালে ভলতের বিশ্লেষকদের মধ্যে মতবিরোধ কম হয়নি, যেমন ১৭৪৩ এর সেপ্টেম্বরে প্রাপ্ত চিঠি বলে যা সংরক্ষিত তা হয়ত জানুয়ারী ১৭৪৬ এর মাঝামাঝি কোন এক সময় লেখা। এই চিঠিতে ভলতের লেখেন – **"প্রিয় দনি, ভার্সেই'র মত এত দূরে থাকা আমার দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে। হয়ত আমার বিরোধী আর চক্রান্তকারী মানুষগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকতেই এই পরিকল্পনা কিন্তু কখনও কখনও মনে হয় ভীষণ বোকা আর দুঃখী একজন আমি, যে কিনা তোমার সাথে থাকতে পারছে না। থাকা তো উচিত ছিল এই রাজা রাজপ্রাসাদ আর প্রতারকদের থেকে দূরে বহুদূরে এক মানানসই স্থির পৃথিবীতে। কিন্তু পারছি কই ? কেবলমাত্র যারা তাদের প্রিয় মানুষগুলোর সাথে থাকছে তারাই ভালোবাসা অনুভব করছে। আশা করছি শীঘ্রই ফিরে আসব আর তোমার সান্নিধ্য আমার সমস্ত অসুখের নিরাময় হয়ে উঠবে। দেখ, কি ভাগ্য কি নিদারুণ অসহায়তা, দুজনে দুজনকে কামনা করি অথচ দুজনে দুজনের থেকে শত দূরত্বে। মাঝে মাঝে নিজেকেই দুষতে ইচ্ছে করে তোমার সাথে এক বাড়িতে এক ঘরে না থাকতে পারায়। ভালো থেকো দনি, আদরের দনি, ফ্লেণ্ডারসের মানুষটির প্রতি সদয় থেকো আর এই ভার্সাই- এর মানুষটার কথাও একটু আধটু মনে কোরো।"**— প্রথম দিকে এই চিঠির তারিখ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ হওয়ায় অনেকেই ধারনা করেন 'ফ্লেন্ডারসের মানুষ' টা আসলে মিঃ দনি অথচ তা হওয়া সম্ভব নয় কারন ওই একই বছরের আগস্টে ভলতের বার্লিনে এসেই ১০ই সেপ্টেম্বর বেইরুটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, এবং জেরা ও হেল হয়ে প্রুশিয়ায় ফেরত আসেন। পরবর্তীকালের সমীক্ষায় চিঠিটি ১৯৪৬ এর মান্যতা পায় এবং 'ফ্লেন্ডারস' এর মানুষটা চিহ্নিত হয় মাদাম দনির স্বামী না হয়ে তার ভাই হিসেবে।

কখনও কখনও ভলতের নিজেকে দনির 'বেটার- হাফ' বলে স্বগোক্তি করেছেন তাঁর চিঠিতে। ভালোবাসার এক নিজস্ব ভুবনে যেন একান্তে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন ভাগ্নী মাদাম দনিকে। বর্জিত বাসরশয্যা থেকেও বিপ্রতীপ ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছে- *"You are half of me, and the better half"* স্বর্গের সাথে তুলনা করেছেন তার প্রিয়তমাকে। অপেক্ষা করেছেন প্রতিটা দূরত্বের থেকে ফিরে আসার, হৃদয় মনের অভ্যেস হয়ে ওঠার। প্রতিটা কাজের আগেই ভলতেরের যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনের ব্রত উদযাপনের তেমনি দনির

অসাক্ষাতের কিছু নিঃসঙ্গ মুহূর্তও তাকে ঘিরে থাকত সবসময়, আহত অর্ধভূক্ত এক পাখির মত তিনি যেন বারবার ফিরে যেতে চাইতেন প্রচলিত নিয়মের বাইরের এক নীল নির্জনে। দনিই ছিলেন তাঁর প্রকৃত আনন্দ প্রকৃত অঙ্গীকার। *"I Will come back to my only real pleasure, to my dear heaven, to you, my own soul"* । ১৯৪৮ এর ২২এ মে রোববার, ভলতের দনিকে তাঁর ভালোবাসার স্বপ্নরাজ্যের হদিশ দিতে চিঠি লিখলেন ফের, কি অসাধারণ সে চিঠি ! যেন নিজেকেই নিজের কাছে হারিয়ে দিয়ে প্রেমিকাকে জিতিয়ে দেওয়ার স্বপ্রতিষ্ঠিত সত্য। যেন এক আত্মহারা মানুষ তার প্রকৃতিস্থ পৃথিবীর সবটুকু খুলে দেখাতে চাইছেন আত্মমগ্ন আরেকজনকে, পর্যাপ্ত ও পরিণত ভালোবাসার সমস্তটুকু সঞ্চয় হৃদয়ের কোনো অবুঝ অপরিণত রোদে মেলে দিতে চাইছেন – **"যদি আমাকে ক্ষমা করার কিছু থাকে, তবে কেবল একটা বিষয়েই ক্ষমা কর যে আজও তোমাকে ভালোবাসার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি দেখাতে পারিনি, দেখাতে পারিনি ঠিক কতটা অন্বেষণ তোমাকে ঘিরে। আমার সমস্ত লক্ষ্য সমস্ত উদ্দেশ্যের এক ও অদ্বিতীয় শেষ তুমি। আর এভাবেই আমি নিজেকে নিজেই খুশি রাখি। তুমি আমার সান্ত্বনা হয়ে ওঠ আর আমার কাছে একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায় জীবন আর জীবনের শেষেও তোমাকে খুশি রাখা। সেদিন পর্যন্ত আমার ভালোবাসা অটুট থাকবে যেদিন প্রকৃতির নিয়মে আমরা বিচ্ছিন্ন হব, সেদিন অবধি ভালোবাসতে দাও আমাকে। হাজার হাজার চুমু।"**

স্রোতের বিপরীতে গিয়ে যে ভালোবাসার কাছে হেরে বসেছিলেন ভলতের সে ভালোবাসা কোথাও ছিল একতরফা, কখনও তিনি নিজেই অভিভাবকের ভূমিকা নিয়েছেন আবার কখনও হয়ে উঠেছেন গন্তব্যবিস্মৃত ছেলেমানুষ, পাকস্থলীর ব্যথায় ছটফট করতে করতে চিঠি লিখেছেন দনিকে। ভালোবাসার থেকেও তাতে ধরা পড়ে সারল্য, দূরত্বের সংসর্গে থেকেও কত সহজ সেসব ভাবনা-

"দেখ দেখি, আমরা দুজনেই পাকস্থলীর রোগে ভুগছি। আমার ভীষণ রাগ হয় যখন তোমার কোমল শরীরে অসুখ তার হাত দেয় কিন্তু আবার তাকে আমি ক্ষমাও করে দিই যখন একই রোগে আমায় পেয়ে বসে, সেসব মুহূর্তে শুধু আমাদের দুজনের সাদৃশ্যতা আমাকে অপার আনন্দ দেয়।"

আবার অসুখের থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই উপচে পড়ে তাঁর ভালোবাসা, একে অপরকে জড়িয়ে আত্মার মায়াবিম্বর খোঁজে। আশ্চর্য দ্বৈততায় ভরপুর ভলতেরের প্রণয়। কিছুতেই তাকে যেন বশে আনা যায়না কোনো প্রথাসিদ্ধ নিয়মে। অসুখের বিছানা থেকেই এক অকেজো মানুষের কন্ঠে শোনা যায় অস্পষ্ট অস্থায়ী অপর এক চরিত্রের ওপর কি অস্বাভাবিক নির্ভরতা, সেসব পরিমাপের ফিতে নেই কেবল সাদা খাতার মত অনুভূতির পাতায় লিখে রাখা ভালোবাসা মানে সীমানা পেরোনো কিছু শুদ্ধ বিস্ময়ের অপেক্ষা - *"I Miss You. When I am feeling ill I want to die in your arms, and when good health returns I want to live with you"* । কখনও কখনও কন্ঠস্বরের দৃঢ়তা ভেঙে অভিমানের স্বরও তীব্র হয়েছে পঞ্চাশোর্ধ ভলতেরের গলায়। পৃথিবীর সব মানুষকে একদিকে রেখে তিনি যে অন্যদিকে পেতে চেয়েছেন দনিকে, অপলক তাকিয়ে থাকতে চেয়েছেন, বিস্মিত হতে চেয়েছেন, সংশয়হীন প্রলিপ্ত সমর্পণ চেয়েছেন। চিঠির

উত্তর না পেয়ে লিখেছেন - **"আমাকে অবজ্ঞা কর কেন সোনা ? কেন আমাকে বারবার বর্জন কর . ... চিঠি লিখছ, কুঁড়ে মানুষ ! কোথায় আছো ! কি করছ ! তোমার নাটক আর অপেরা সম্পর্কে কি কিছুই জানাবার নেই ? তোমার আনন্দ আর উছ্বাস সম্পর্কে ? সারাটা জীবন আমি রোমন্থন করে গেলাম কীভাবে জীবনের শেষ কটা দিন তোমার সাথে কাটাতে পারব ভেবে ভেবে। অন্তত একটা চিঠি লেখ। আমার মনটাকে নিজের মন ভেবেই না হয়, আর আমার শেষ নিঃশ্বাস অবধি সেটা যে তোমারই সেটাও জেনে রেখ"**। প্রতিটা মুহূর্তে ভলতের মানসিক ভাবে প্রার্থণা করতেন দনির অপেরা দনির নাটক কমেডি সব যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, তাতেই তাঁর আনন্দ। এমনকি দনির নিজের লেখা নাটক 'মিনার্ভা' কে নিজের সন্তানের সাথে তুলনা করেছেন তিনি। পত্রপাঠ জানিয়েছিলেন - **"আমি এই নতুন সন্তানের মা কে হাজার বার চুম্বন করতে প্রস্তুত। কোনো ওষুধ বা অক্ষয় আশির্বাদ নয় বরং বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে হয় তোমার লেখার কাছে। আমার অসুস্থ শরীরে চিকিৎসকের হাত নয় বরং তোমার অক্ষরের ছোঁওয়া জরুরী।"**

প্রুশিয়ায় ভলতেরের সাথে থাকতে অস্বীকার করেন মাদাম দনি। এবং দনিকে লেখা ভলতেরের অধিকাংশ চিঠিই প্রুশিয়ার রাজসভা ত্যাগ করে ভলতেরের ফিরে আসার আগের সময়সীমাকেই অনুভূতির সমানুপাতে ধরে রাখা। পরবর্তীকালে দনি এবং ভলতের একই সাথে জীবনের শেষদিন অবধি দাম্পত্য জীবন কাটান যদিও সামাজিক বিয়ে তারা করেননি কোনোদিনই। যৌনতার ছোঁওয়ায় লেগেছে চিঠিতে কখনও কখনও, আগুন তাড়িয়ে নিতে চেয়েছে শারীরীক শীতগুলোকে। ১৭৪৮ এর ২৭ এ জুলাইয়ের চিঠিতে ভলতের লিখছেন – *"I shall be coming only for you, and if my miserable condition permits, I will throw myself at your knees and kiss all your beauties. In the meantime I press a thousand kisses on your round breasts, on your ravishing bottom, on all your person which has so often given me erections and plunged me in a flood of delight"* । অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্কে যা যা থাকা উচিত ধরে নেওয়া যায় তার সবই ছিল, আর ছিল বলেই ভলতের তাঁর অবলোকনে নিজের স্ত্রী হিসেবেই পরবর্তীকালে দনিকে স্বীকার করতে চেয়েছিলেন। বার বার উল্লেখ করেছেন **"মাই ওনলি হ্যাপিনেস উড বি টু লিভ উইথ ইউ"**। ধর্মীয় অনুশাসনের সে যুগেও Avunculate Marriage বা মামার সাথে তার নিজের ভাগ্নীর বিবাহ বিষয়ে ভলতেরের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল বেশ স্বচ্ছ। "La Defense de mon oncle" এর ছয় নম্বর অংশেই ভলতের পোপের অনুমতিস্বাপেক্ষে এজাতীয় বিয়ের সমর্থন করেছেন এবং স্বপক্ষে উদাহরণও দেখিয়েছেন বেশ কিছু। পাশাপাশি চিঠির গোপনীয়তাতেও সজাগ দৃষ্টি ছিল ভলতেরের, ১৭৪৬ এ ২৯শে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে ভলতের দনিকে উপদেশ দেন সাবধানে এবং সর্তকতার সাথে চিঠি লিখতে আর তার কারণ হিসেবেও চিঠির খোলা পড়ে থাকার অথবা অন্য কেউ খুলে পড়ে ফেলার যুক্তিকেই দেখিয়েছেন ভলতের।

১৭৪৯ এবং তার পরবর্তী সময়ে যে চিঠিগুলো আমাদের হাতে আসছে তাতে চিঠির সম্বোধনে 'My dear' থেকে 'Darling' এর এক আশ্চর্য পরিবর্তণ লক্ষ্যনীয়। বয়স বাড়ছে ক্রমশ ভলতেরের, কাজের চাপে দুর্বল হয়ে পড়ছে শারীরীক অবস্থা আর তিনিও যেন মানসিকভাবে

নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন দনির ওপরে। কেবল সঙ্গী হিসেবে নয় দনিকে পেতে চেয়েছিলেন একজন সৃষ্টিশীল সহচরী হিসেবেও, কখনো রুশোর চিঠি নিয়ে তো কখনো অপেরার নাটক নিয়ে বা দনির নিজের লেখালিখি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে পত্রমারফত, মতবিনিময়ও হয়েছে। ভলতেরের নিজের বই 'ক্যাটিলিনা'র পাণ্ডুলিপি পড়ে দনির মতামত আর ভালোলাগাগুলোও জানতে চেয়েছেন ভলতের আর এই সার্বিক সাংস্কৃতিক ব্যাপনগুলোই ধীরে ধীরে খুঁজে ফিরেছে একটি সম্পূর্ণ সাংসারিক ব্যালাড। বার বার বলেছেন আমার প্রকৃত ঘর তোমার কাছে, বাকি সবই বিদেশ, তুমিই আমার সম্পূর্ণ পরিবার, আমার পরিষদ, আমার ভার্সেই আমার পারনাসাস এবং একমাত্র আশা।

এক গোছা বিরহ মধুর চিঠির শেষে এসে প্রশ্ন উঠতেই পারে কী পেলাম ! একটা অন্ধকারের দ্বন্ধ ছাড়া একটা আঁধার অতীত ছাড়া কি পেলাম আমরা ! না কোনো সোনাদানা মণিমাণিক্য নয় কেবল কিছু ছায়া যার ভেতর লুকিয়ে আছে দীর্ঘতম গল্পের স্নায়ু যার ভেতরে রোদ্দুরের প্রত্যাশায় পা দুলিয়ে আছে আমাদেরই নিজেদের কোনো ভিজে কবিতা। কোথাও যেন গবেষণা থেমে যায় এমনই সব গেরুয়া রঙের কাছে এসে, স্মৃতির নিঁখুত ভাঁজের কাছে এসে। উদ্ভাসিত অথচ প্রচ্ছন্ন এতসব চেনা অচেনার বাইরে অনতিস্ফূট হয়ে বেরিয়ে আসে ভালোবাসা সম্পর্কে ভলতেরেরই নিজস্ব দর্শন - *"There are so many sorts of love that one does not know to whom to address oneself for a definition of it. The name of "love" is given boldly to a caprice lasting a few days, a sentiment without esteem, gallant's affections, a frigid habit, a romantic fantasy, relish followed by prompt disrelish"* - - - সত্যিই তো ভালোবাসার কত নাম কত রং কত অভাবনীয় সম্প্রসার যার কালসিন্ধুতে একগোছা সাদা- কালো অক্ষরের ক্ষণকালীন হাত ডুবিয়ে আমরাও বসে থাকি শুধু কিছু সম্পর্কের কিছু সম্পূর্ণতার চিরকালীন রঙীন গ্যাসবেলুন পাওয়া যাবে ভেবে …ওই যে ১৮৭৮ সালে ভিক্টর য়ুগো (Victor Hugo) মৃত্যু শতবার্ষিকীতে ভলতেরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন না, - 'আজ থেকে একশ বছর আগে একজন মানুষ মারা যাচ্ছিলেন। অমরত্ব লাভ করে তিনি মারা যাচ্ছিলেন' – ঠিক তেমনিই হয়ত চিঠিগুলোও অমর হয়েই বেঁচে আছে ভালোবাসার 'সুখদুখমন্থনধন'ভরে. . .